প্রাক্‌কথন

'বন্ধু' মানবজীবনে সামাজিক বন্ধনের আবরণে মোড়া একটি সম্পর্ক। সমাজ নামক এক বিশাল গণ্ডীর মধ্যে যার বিস্তার। মানবজীবনে মা, বাবা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী প্রভৃতি সম্পর্কের মতো 'বন্ধুত্ব' একটি বড় সম্পর্কের বন্ধন। তবে এ সম্পর্ক হৃদয়ের সম্পর্ক, রক্তের নয়। সমাজ জীবনে মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি সম্পর্কের বন্ধন হল রক্তের। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এ সম্পর্কগুলির বিকাশ স্বাভাবিকভাবেই হয়ে উঠতে থাকে। একটি ছেলে বা মেয়ে জন্মানোর পর স্বাভাবিকভাবে রক্তের বাঁধনেই তার পিতা, মাতা বা মেয়ে বা পারিবারিক জীবনের সকলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সকল সম্পর্ক জন্ম-নির্ধারিত। কিন্তু বন্ধুত্ব এরকম জন্ম-নির্ধারিত সম্পর্ক নয়। কেননা জন্মের পর থেকে কোনো ব্যক্তির বন্ধুত্ব ঠিক হয়ে থাকে না। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়ে, মনের মিলেই তা মূলত গড়ে ওঠে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বন্ধুত্ব তৈরি করে নিতে হয়। আপনা থেকে তা সৃষ্টি হয় না। আর এ ক্ষেত্রে হৃদয়ের একটি বড় ভূমিকা থাকে। কেননা হৃদয়গত মিল ছাড়া এ সম্পর্কের সৃষ্টি হতে পারে না, তেমনি তার অস্তিত্বের স্থায়িত্ব বেশি দিন হয় না। সুতরাং বন্ধুত্ব হল দুই মানব হৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। দুই হৃদয়ের গভীর যোগসূত্রে যার সৌধটি তৈরি হয়। কোনো বন্ধুত্ব সৃষ্টির সময় যেমন আমাদের জানা থাকে না, তেমনি তার বিনাশের সম্ভাবনার ইঙ্গিতও আমরা দিতে পারি না। বন্ধুত্ব প্রাচীনকাল থেকে সমাজে প্রবহমান একটি সম্পর্ক। সামাজিক গণ্ডীর প্রশস্তময় তটে তা বয়ে চলেছে আজও। পারিবারিক জীবন বা সম্পর্কের বাইরে গড়ে ওঠা এই সম্পর্কটির প্রসার বা কার্যকারিতা হয়ত বাহ্যিক সম্পর্কের দিক দিয়ে ধরলে সর্বাধিক।

'বন্ধু' শব্দের অর্থ হল সখা বা মিত্র বা সুহৃদ, হিতৈষী ব্যক্তি। এই সম্পর্ক নির্মাণে পাশাপাশি দু'জন ব্যক্তির প্রয়োজন। দুই পুরুষ বা দুই নারী, বা এক পুরুষ আর এক নারী। দুই ব্যক্তির হৃদ্য সম্পর্কই হল বন্ধুত্ব। অর্থাৎ দুই বন্ধুর মধ্যেকার যে সম্পর্ক বা বন্ধন,

তাই হল বন্ধুত্ব, মৈত্রীত্ব বা সখিত্ব। সংস্কৃতে পাশাপাশি দুই বন্ধুর সম্পর্ককে 'সখিত্ব' আর দুই নারীর মধ্যেকার বন্ধুত্বকে 'সখীত্ব' বলা হয়। তবে বাস্তবের দিকে তাকালে দেখা গেছে বন্ধুত্ব সাধারণত সমলিঙ্গের মধ্যেই বেশি সৃষ্টি হয়ে আছে। স্পষ্ট করে বললে একজন পুরুষের সঙ্গে অপর একজন পুরুষের বা একজন নারীর সঙ্গে অপর একজন নারীর সমলিঙ্গের বন্ধুত্বই বেশি দেখা যায়। কিন্তু তাই বলে একজন নারীর সঙ্গে একজন পুরুষের কি বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না, অবশ্য ওঠে। তবুও সমাজে নারী-পুরুষের বন্ধুত্বের চেয়ে অনেক বেশি দেখা যায় পুরুষ-পুরুষের বন্ধুত্ব বা নারীর সঙ্গে নারীর বন্ধুত্ব। নারী আর পুরুষের সম্পর্ক যেন অনেকটা ঘি আর আগুনের মতো যেখানে শান্ত, সংযত বা ঠান্ডা থাকার চেয়ে বরং জ্বলে ওঠার সম্ভাবনাই বেশি। নারী বা পুরুষের চিরন্তন প্রকৃতি-ধর্মই অনেকক্ষেত্রে সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সমলিঙ্গের বন্ধুত্বের গুরুত্ব বা প্রসার সেই কারণে বাস্তব সমাজে বেশি। এখন প্রশ্ন হল ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এই সম্পর্ক গড়ে উঠল কীভাবে? মানুষই বা ঐ সম্পর্কটিকে আবিষ্কার করল কীভাবে? এটা কি হঠাৎ করে গড়ে উঠেছে, নাকি পরিকল্পিতভাবে এ সম্পর্কটির সৃষ্টি হয়েছে? আসলে বাস্তবে আমরা দেখতে পাই রক্তের বন্ধনের বাইরে দুই ব্যক্তির হৃদয় নৈকট্যেই এই সম্পর্কের সৃষ্টি। কিন্তু মানুষ কীভাবে এই সম্পর্কটির সঙ্গে পরিচিত হল বা সমাজে এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারল, তা অবশ্যই একটি বড় প্রশ্ন। এর উত্তর আমাদের খুঁজতে হবে। মনে হয় সমাজ-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এ সম্পর্কটির আবির্ভাব ঘটেছে আমাদের জীবনে। আমরা যদি একটু পিছন ফিরে তাকাই তাহলে বোধহয় এর উত্তর পাব। আমরা জানি আদিম মানুষ ছিল বনবাসী, ফলমূল আহরণকারী। পশুর মতো ছিল তাদের জীবনযাপন। আর সবচেয়ে বড় জিনিস যা তা হল, তারা ছিল ভয়কাতর। প্রকৃতির রহস্যপূর্ণ বিষয়গুলি বা পশু-প্রাণীদের হিংস্রতা তাদের মনে জাগাত শঙ্কা বা ভয়। ফলে আস্তে-আস্তে তারা বাঁচার তাগিদে একত্রিত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে। হিংস্র পশু বা প্রকৃতির অনিবার্য বিপদের হাত থেকে বাঁচতে এরপর শুরু হয় দলগতভাবে থাকার প্রয়াস। এই প্রয়াসই অতীত মানব ইতিহাসের প্রথম দলগত মৈত্রীর নিদর্শন। বাঁচতে হলে একসঙ্গে থাকতে হবে। এই ধারণা থেকে প্রাচীনকালে যে

দলগত মৈত্রীর ভাবনা তৈরি হয়, পরবর্তীকালে সমাজ-বিবর্তনের ফলে জীবন বা সমাজ বন্য পরিবেশ থেকে উন্নততর পথে যাত্রা করলে, সেই মৈত্রী আরও বৈচিত্র্যময় রূপ ধারণ করে। দলগত মৈত্রী সংকীর্ণ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মৈত্রীতে রূপান্তরিত হয়। প্রাচীনকালে মানুষের শুধু বন্ধুত্বই নয়, অন্য সামাজিক সম্পর্ক বিষয়েও বিশেষ ধারণা ছিল না। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে, মানব জীবনের ক্রমবিকাশের পথে, মানুষ একটু-একটু করে সামজিক সম্পর্কগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়। মানুষের সচেতন মন সম্পর্কের গুরুত্বকে বুঝতে পারে। বন্ধুত্বের ধারণা মানব মননে এই রকম ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে জাগ্রত হয়েছে। মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে আদিযুগে সমষ্টিগত জনজাতির মধ্যে আস্তে-আস্তে চেতনার বিকাশ, বোধ-বুদ্ধির জাগরণ তাদেরকে উত্তীর্ণ করে আজকের সামাজিক পটভূমি বা সম্পর্কের বৃহত্তর আঙিনার মধ্যে। সৃষ্টির সূচনাকালে মূলত তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে আজকের এই আধুনিক সভ্য সমাজ-যে সমাজ বিভিন্ন মানবের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা সম্পর্কের অনিবার্য বাঁধনে গঠিত। আজকের সমাজে মানবের পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ বা যোগাযোগ অত্যন্ত বেশি। অথচ সৃষ্টির আদি স্তরে তা ছিল না। সম্পর্ক হিসেবে বন্ধুত্ব বিবর্তনেরই এক বর্তমান রূপ। বন্ধুত্ব আজ সভ্যতার অগ্রগতির ধারায় একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক বন্ধন। পারিবারিক জীবনের বাইরে যেখানে ব্যক্তির পদার্পণ ঘটে, এই বন্ধুত্বই বোধহয় তাকে সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রিত করে। আমরা বাস্তবে জীবনে প্রায় সকলেই কম-বেশি এ সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত। আমরা প্রত্যেকে কারো না কারো বন্ধু। এই 'বন্ধু' বা 'সখা' শব্দটির সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকেরই গভীর যোগ রয়েছে। আমাদের বাস্তব জীবনে বন্ধুত্বের সঙ্গে যেমন গভীর যোগ আছে, আবার সাহিত্যেও এই সম্পর্কটির উপস্থিতি একেবারে কম নয়। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত সময়ে বিভিন্নভাবে সাহিত্যে এই সম্পর্কটির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। লেখকরা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে বন্ধু বা বন্ধুত্বের বিচার করেছেন, সম্পর্কের বাস্তবসম্মত রূপদান করেছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্ধু সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন – ''বাগানের মধ্যে গোলাপ যেমন একটি বিশেষ জাতের ফুল, বন্ধু তেমনি একটি বিশেষ জাতের মানুষ। এক-একটি লোক আছেন পৃথিবীতে তাঁহারা বন্ধু হইয়াই

জন্মগ্রহণ করেন। মানুষকে সঙ্গদান করিবার শক্তি তাঁহাদের অসামান্য এবং স্বাভাবিক। আমরা সকলেই পৃথিবীতে কাহাকেও না কাহাকেও ভালবাসি, কিন্তু ভালোবাসিলেও বন্ধু হইবার শক্তি আমাদের সকলের নাই। বন্ধু হইতে গেলে সঙ্গদান করিতে হয়। অন্যান্য সকল দানের মতো এ দানেরও একটা তহবিল দরকার, কেবলমাত্র ইচ্ছাই যথেষ্ট নহে। রত্ন হইতে জ্যোতি যেমন সহজেই ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি বিশেষ ক্ষমতাশালী মানুষের জীবন হইতে সঙ্গ আপনি বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। প্রীতিতে প্রসন্নতাতে সেবাতে শুভ-ইচ্ছাতে এবং করুণাপূর্ণ অন্তরদৃষ্টিতে জড়িত এই-যে সহজ সঙ্গ, ইহার মতো দুর্লভ সামগ্রী পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। কবি যেমন আপনার আনন্দকে ভাষায় প্রকাশ করেন, তেমনি যাঁহারা স্বভাববন্ধু তাহারা মানুষের মধ্যে আপন আনন্দকে প্রতিদিনের জীবনে প্রকাশ করিয়া থাকেন।''[১১] আবার উনিশ শতকের এক ঔপন্যাসিকের ভাষায় – ''পৃথিবীতে বন্ধুর সদৃশ প্রিয় সামগ্রী আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি ইহ জীবনে প্রকৃত বন্ধু পাইয়াছেন, তিনিই সুখী; নতুবা কপট বন্ধুর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস সংস্থাপন করিয়া, বারে-বারে বিপদ-জালে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়।''[১২] উনিশ শতকের আর এক সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ রায়ের বন্ধু সম্পর্কে মূল্যায়ন হল – ''মহাতপ্ত মরুভূমির বক্ষে ওয়েসিস, গভীর ও সুবিশাল মহাসাগরের হৃদয়ে দ্বীপ, প্রচন্ড মার্তন্ডতলে দীর্ঘকালস্থায়ী মেঘখন্ড, অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় সুশীতল বায়ু ও জল যে রূপ হিতকারী, মনুষ্যের মধ্যে প্রকৃত বন্ধু তাহাই। বিপদে ধৈর্য্যের ন্যায়, রোগে ঔষধের ন্যায়, ভয়ে ভরসার ন্যায়, অন্ধকারে আলোকের ন্যায়, যন্ত্রণায় উপশমের ন্যায়, অশান্তিতে শান্তির ন্যায়, শরীরে প্রাণের ন্যায় যাঁহার প্রকৃত বন্ধু নাই তাঁহার কেহই নাই। এই মানব জগতে প্রকৃত বন্ধু নিতান্ত দুর্লভ; তবে যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, তাঁহার ভাগ্যেই এ হেন স্বর্গীয় রত্ন লাভ হইয়া থাকে। বন্ধুর নিমিত্ত বন্ধু জীবন দেয়, পৃথিবীতে এইরূপ বন্ধুর সংখ্যা কয়টি? একবৃন্তে দুইটি কুসুমের ন্যায়, দুই শরীরে একপ্রাণ না হইলে প্রকৃত বন্ধুত্ব ঘটে না। এক জনের সুখে আর এক জনের সুখ এবং দুখে দুঃখ উৎপন্ন না হইলে প্রকৃত বন্ধুত্ব সংগঠিত হয় না।''[১৩] এই শতকের আর এক ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবীর মতে – ''যাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি, যাহার স্বভাবের ভিতর প্রবেশ করিয়া সহানুভূতি

সূত্রে যাহার সহিত গ্রথিত হইতে পারি তাহাকেই প্রকৃত বন্ধু মনে করতে পারি।''[৪] আবার সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু তাঁর উপন্যাসের নায়িকার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন — ''এ বন্ধুতারূপ সম্পর্কটা মানুষের সভ্যতার একটা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।''[৫] এইভাবেই সাহিত্যিকদের ভাবনায় মানবজীবনের এই সম্পর্কটি এক বড় মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে। আমরা পূর্বে বলেছি যে এই সম্পর্ক রক্তের নয়, হৃদয়ের সূত্রে গ্রথিত। দেখা যায় পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে দুটি হৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্পর্কটির এক বিরাট ধারা প্রবাহিত হয়েছে। লেখকরা অনেক সময় এ সম্পর্কটির বহুরূপতা তাঁদের সাহিত্যে প্রতিফলিত করেছেন। বন্ধুত্ব অন্যান্য সম্পর্কের মতো সামাজিক জীবনের একটি সম্পর্ক। তবে বাস্তবজীবনে যেমন সব সম্পর্কের রূপ সমান হয় না, আলো বা অন্ধকার এই দুই পথে গমন করে, বন্ধুত্বেরও তেমনি এই প্রকার রূপ লক্ষ্য করা যায়। আমরা পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে যে সব সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত থাকি, প্রত্যেকের মধ্যে এক সুস্থ, সুন্দর, মধুর ভাব কামনা করি। কিন্তু বাস্তবে সবসময় তা হয় না। প্রকৃতিতে আলো এবং অন্ধকার এই বিপরীতধর্মী দুটি যেমন দিক আছে, ভালো বা মন্দ বিপরীত দুটি যেমন সত্ত্বা আছে, ঠিক তেমনি সম্পর্কেরও এই রকম দুটি দিক আছে। বাস্তবে মানুষ যেমন সকলে একরকম হয় না, কেউ বা ভালো, কেউ বা মন্দ, তেমনি একটি সম্পর্কও এই দ্বিবিধ রূপে বাস্তবে উদ্ভাসিত।বন্ধুত্বের মধ্যেও ভালো আর মন্দ-এই দ্বিবিধ রূপের স্রোত আছে। পারস্পরিক হৃদ্যতা, মধুরতা, কার্যকারিতা, প্রভাব বা বিভিন্ন অন্ধকার প্রবৃত্তির অন্তরালে তার আসল রূপটি বেরিয়ে পড়ে। আর প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে যে কোনো সম্পর্কের স্থায়িত্বের বিষয়টি। যেখানে সম্পর্কের মধ্যে সুস্থ-সুন্দর-মধুর ভাবময়তা থাকে, তার স্থায়িত্বের পথটি অনেক বড় হয়ে থাকে। আর যেখানে লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতির ভাব এসে উপস্থিত হয়, অনিবার্যভাবে সেই সম্পর্কের স্থায়িত্বের উপরও এক প্রশ্নচিহ্ন পড়ে যায়। মূলত বিভিন্ন প্রবৃত্তিই সম্পর্কের স্থায়িত্ব বা অস্থায়িত্বের রেখাটি তৈরি করে থাকে। আমরা সামাজিক জীবনে বন্ধুত্বের মধ্যে একটি সুস্থ সুন্দর ভাব কামনা করি। কেননা তা শুধু সম্পর্কটির স্থায়িত্বের পথটি যে বাড়ায় তাই নয়, এর মধ্যে লুকিয়ে থাকে এক অনাবিল শাশ্বত সৌন্দর্য। কিন্তু সব সময় তা

হয় না। মানবজীবনে সব সম্পর্কের প্রবাহ যেমন মধুর হয় না, তেমনি বন্ধুত্বের মধ্যেও অনেক সময় আসে স্বার্থপরতা, এককেন্দ্রিকতা প্রভৃতি অন্ধকার প্রবৃত্তির স্রোতরাশি। ফলে সম্পর্কে দেখা যায় ভাঙন। মানবজীবনে ভালো বা মন্দ রূপের মতো বন্ধুত্বেও আমরা দুই রূপকে প্রত্যক্ষ করি অর্থাৎ সহজ কথায় বললে বন্ধুর দুই রূপ। কেউ বা মহৎ, সুহৃদ, পরোপকারী বন্ধু, আবার কেউ হয়ত স্বার্থপর, অসৎ বন্ধু। বাস্তব সমাজজীবনে বন্ধুত্বের এই দ্বিবিধ রূপই সাহিত্যে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে প্রাচীন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়ে। যার প্রথম নিদর্শন হল রামায়ণ, মহাভারতের মতো প্রাচীন মহাকাব্যগুলি। এরপরে হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতির মতো প্রাচীন সাহিত্যেও দেখা গেছে বন্ধুত্বের বিভিন্ন রূপ। বর্তমানে উপন্যাস সাহিত্য সৃষ্টি হলে তাতেও ঘটেছে এর বিপুল বিস্তার।

সাহিত্য হল মানবজীবনের দর্পণ। সমাজ, প্রকৃতি বা মানব-জগতের সব কিছুই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে সাহিত্য সৃষ্টির শুভলগ্ন থেকে মানবের মধ্যে তার জীবনকে সাহিত্যে দেখার আগ্রহ জন্ম নেয়। বৈদিক যুগে রামায়ণ, মহাভারত, যখন সৃষ্টি হয়, তার মধ্যেও লুকিয়ে ছিল বৃহত্তর মানব ও সমাজ দর্শন। মানবিক সম্পর্ক বা তার চিরাচরিত মূল্যবোধ, আদর্শ, সংস্কার, রীতি, নীতি প্রভৃতি সবকিছুর প্রতিফলন ঘটেছে সেখানে। মানবিক সম্পর্ক হিসেবে বন্ধুত্বেরও প্রবেশ ঘটেছে রামায়ণ বা মহাভারতের মতো সুপ্রাচীন দুটি মহাকাব্যে। পরবর্তীকালে হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্রের গল্প বা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতির মধ্যেও বন্ধুত্ব একটি বৃহত্তর রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমরা মানবজীবনে আবদ্ধ বিভিন্ন সম্পর্কের কাছ থেকে একটা সুস্থ মূল্যবোধ আশা করে থাকি। যেখানে নিহিত থাকবে হৃদ্যতা, পবিত্রতা, সহায়তা, সহানুভূতি প্রভৃতির স্রোত। প্রাচীনকালে রামায়ণে বন্ধুত্বের যে রূপকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তার মধ্যে দেখা যায় এই সুস্থ মূল্যবোধের লক্ষণ। রামায়ণে জাতীয় জীবনের এক বৃহৎ ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। অসংখ্য চরিত্র, ঘটনা, নানা সম্পর্কের উপস্থিতিতে তা জাতীয় জনজীবনের সঙ্গে গেঁথে রয়েছে আজও। রামায়ণে

বন্ধুত্বের যে উপাদান বা চিত্র ছড়িয়ে আছে, তার আবেদন সর্বকালীন। রামায়ণের কয়েকটি চরিত্র বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে আদর্শের প্রতীক। সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান, রাম প্রমুখ রামায়ণের এক একজন বীরদীপ্ত চরিত্র হলেও, তাঁরা বন্ধুত্বের মহৎ আদর্শে উদ্ভাসিত। সুগ্রীব রামের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হয়ে সীতা উদ্ধারে সর্বতোভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিল। সুগ্রীবের মিত্রতায় অভিভূত হয়ে রাম বলেছিল -- "দুর্লভো, হীদৃশো বন্ধুরস্মিনকালে বিশেষতঃ"[৬] অর্থাৎ বিপদকালে তোমার মতো বন্ধু সত্যিই দুর্লভ। সুগ্রীব রামায়ণে এক প্রকৃত বন্ধুর প্রতীক, বিভীষণও তাই। সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলে তিনি রাবণের দ্বারা অপমানিত হয়ে, রামের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হন এবং রামকে সীতা উদ্ধারে সাহায্য করেন। রাক্ষসবংশ ত্যাগ করে বিভীষণের রামে যোগদান তাঁকে হয়ত 'ঘরশত্রু বিভীষণে'র তকমায় পরিচিত করে তুলেছে, কিন্তু রামের প্রতি তাঁর বন্ধুত্ব এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই হিতৈষী, সুহৃদ, বিশ্বস্ত বন্ধু ছাড়া রাম রাবণ বধ করে সীতাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারতেন কিনা সন্দেহ আছে। সুগ্রীবের সঙ্গে হনুমানেরও সম্পর্ক ছিল অনেকটা বন্ধুর মতো। উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। আবার রামায়ণের রাম যেমন বীর যোদ্ধা পরম পুরুষ, তেমনি একজন বন্ধু হিসেবেও মহিমান্বিত। রাম গুহক চণ্ডালের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। আর্য রাম ও অনার্য গুহক চণ্ডালের বন্ধুত্ব দেশকাল ছাড়িয়ে সর্বজনীন, শাশ্বত মূল্যবোধে সিক্ত। এছাড়া সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে তিনি বালীকে অন্যায়ভাবে বধ করে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করেন। বিভীষণের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হয়ে রাবণকে বধ করার পর তিনি বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করেন। রামায়ণে রাম এক অসাধারণ পুরুষের পাশাপাশি এক মহৎ বা আদর্শ বন্ধুও বটে। তবে সুগ্রীবের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব স্থাপিত হলেও উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের এক শর্ত ছিল যে তিনি বালীবধ করে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করবেন এবং পরিবর্তে সুগ্রীব সীতা উদ্ধারে তাঁকে সাহায্য করবেন। আপাতদৃষ্টিতে বন্ধুত্বের মধ্যে এই রকম শর্ত আরোপ স্বার্থের বিষয়টিকে আমাদের মনে করায়। কিন্তু এটা ঠিক যে উপকারের দ্বারা অনেক সময় বন্ধুত্ব তৈরি হয়। আবার এর পাশাপাশি বন্ধুত্বে কর্তব্যবোধের স্রোতটিও প্রসার লাভ করে। স্বাভাবিকভাবে

বন্ধুত্বে সাহায্য, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, উপকার প্রভৃতির ভাব সম্পর্কটিকে এক অমলিন সৌন্দর্যময়তায় প্রতিষ্ঠিত করে। যার ফলে তা হয়ে ওঠে এক আদর্শ মূল্যবোধের প্রতীক। কাজেই রামের সঙ্গে সুগ্রীবের মিত্রতায় স্বার্থের বিষয়টি এলেও দুজনেই সম্পর্কের মূল্যবোধকে শেষ পর্যন্ত ধরে রেখেছিল। বরং এটাকে স্বার্থের ভাবদৃষ্টিতে না দেখে বন্ধুর প্রতি বন্ধুর কর্তব্যবোধ, কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ বা উপকার সাধনের নিদর্শন হিসেবে দেখা ভাল। বিভীষণ স্বেচ্ছায় এসে রামের সঙ্গে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। বিভীষণ রামকে সর্বপ্রকারে সহায়তা করেছিল। আর রামও রাবণবধের পর তাঁকে লঙ্কার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে দিয়েছিল। কিন্তু তা কোনো শর্তানুসারে নয়, বন্ধুত্বের প্রতি ভালোবাসা বা কর্তব্যবোধের শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে। রামায়ণে যে সব চরিত্রের মধ্যে বন্ধুভাব ফুটে উঠেছে প্রায় সবই এক মহৎ ভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণের মতো বেদব্যাস রচিত মহাভারতও জাতীয় জনজীবনের ছবি। সেখানে নারী এবং পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে ভারতের শাশ্বত ধর্ম প্রবাহিত হয়েছে। পারিবারিক সম্পর্ক, সম্পর্কের চিরন্তন ধর্ম, ন্যায়-নীতি, সংস্কার, আদর্শ, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ - প্রভৃতির এক বিরাট উৎস হল মহাভারত। রামায়ণের রাম, সুগ্রীব, বিভীষণের মতো সেখানেও দেখা গেছে আদর্শখচিত বন্ধু। মহাভারতেও কৃষ্ণ, কর্ণ, অর্জুন প্রমুখ যেমন এক-একজন বীর চরিত্র, তেমনি এর পাশাপাশি এরা বিভিন্ন সম্পর্কের জালে বন্দী সামাজিক চরিত্র। এরা কেউ মহৎ ভ্রাতা, বন্ধু, স্বামী বা অন্য কোনো আত্মীয়। রামায়ণের মতো মহাভারতেও ফুটে উঠেছে আদর্শ বন্ধুর দৃষ্টান্ত। মহাভারত বন্ধুত্বের এক মহান আদর্শের দৃষ্টান্তে উদ্ভাসিত। বিশেষ করে কৃষ্ণ বা কর্ণের মতো চরিত্রে বন্ধু- প্রীতির প্রকাশ বেশি লক্ষ্য করা গেছে। কৃষ্ণ তো সবসময় অর্জুনের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৃষ্ণ ছাড়া অর্জুনের জেতা সম্ভব হত না। বিপদে পরামর্শ দিয়ে কৃষ্ণ অর্জুনের সহায়তা করেছিল। আবার কর্ণও রাজ্যের প্রলোভন বা মাতার ডাককে উপেক্ষা করেছিল বন্ধুত্বের কারণেই। সে দুর্যোধনের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে ছিল বাঁধা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে মাতা কুন্তী তাঁর আসল পরিচয় প্রকাশ করলেও সে বন্ধুকে ছেড়ে পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করেননি। সে একজন বীর

যোদ্ধা, পাশাপাশি একজন প্রকৃত বন্ধুও বটে। রামায়ণ, মহাভারতের মতো প্রাচীন মহাকাব্যে কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে যে অসাধারণ বন্ধুপ্রীতি বা আদর্শবোধের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা গিয়েছিল, পরবর্তীকালে হিতোপদেশ বা পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা রচিত পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলিতে সেই বন্ধুত্বের এক নতুন মূল্যবোধকে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছিল। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের এক সুন্দর নিদর্শন হল এই গ্রন্থ দুটি। সম্ভবত হিতোপদেশ আগে এবং পঞ্চতন্ত্র পরে রচিত হয়েছিল। হিতোপদেশের রচয়িতা হলেন নারায়ণ। এই দুটি গ্রন্থে মূলত মানবজীবনে চলার পথে বিভিন্ন নীতিকথা স্থান পেয়েছে। গল্পের পাত্র-পাত্রীদের অনেকেই বনের পশু-পাখি। রচয়িতাগণ এদের মধ্য দিয়েই মানবজীবনে বেঁচে থাকার জন্য মহান উপদেশ প্রদান করেছেন। জীবনে চলতে গেলে কোন পথ গ্রহণীয়, কোন পথ বর্জনীয়, ন্যায়-অন্যায় বা সত্য-মিথ্যা বোধ, মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা বা না করা, ধর্মের প্রতিষ্ঠা, অধর্মের বিনাশ সাধন প্রভৃতি সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থদুটিতে। পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশ গ্রন্থদুটিতে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে মূল্যবান উপদেশ নিহিত আছে। এই দুটি প্রাচীন গ্রন্থে বন্ধুত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে।

নারায়ণ রচিত হিতোপদেশ প্রধানত উপদেশমূলক। এখানে জীবনে চলার পথে সঠিক দিশা কী, ন্যায়ধর্ম, সত্যধর্ম গ্রহণ, লোভ-লালসা, হিংসা, অধর্ম বর্জন এবং আরো বিভিন্ন বিষয়ের মূল্যবান উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। এই গ্রন্থের চারটি খণ্ড যথা ১) মিত্রলাভ ২) সুহৃদ্ভেদ ৩) বিগ্রহ এবং ৪) সন্ধি। হিতোপদেশেও একজন প্রকৃত বন্ধুর লক্ষণ, সমাজে বন্ধু থাকার ফল, কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত প্রভৃতি বন্ধুত্বের নানা বিষয়ের জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, যার সঙ্গে পরবর্তী পঞ্চতন্ত্রের অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়। হিতোপদেশে বন্ধু বা বন্ধুত্ব সম্পর্কে যে মূল্যবান উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। সেগুলির কিছুকে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

হিতোপদেশে বলা হয়েছে _

" দুর্জনেন সমং সখ্যং প্রীতিং চাপি ন কারয়েৎ।" [৭]

অর্থাৎ খারাপ বা দুর্জন লোকের সঙ্গে কোনো বন্ধুত্ব বা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা ঠিক নয়।

" মৃদ্‌ঘটবৎ সুখভেদ্যো দুঃসন্ধানশ্চ দুর্জনো ভবতি।
সুজনস্তু কনকঘটবদ্দুর্ভেদ্যশ্চাশু সন্ধেয়ঃ ।।" [৮]

অর্থাৎ দুর্জন বা খারাপ লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব মাটির পাত্রের মতোই ভঙ্গুর যাকে আর জোড়া দেওয়া যায় না। কিন্তু মহৎ বা ভালো লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব সোনার পাত্রের মতো, সহজে ভেঙে যায় না। আর যদিও ভাঙে, তাকে জোড়া দেওয়া সহজ।

" শত্রুণা ন হি সংদধ্যাৎ সুশ্লিষ্টেনাপি সন্ধিনা।" [৯]

অর্থাৎ শত্রুর সঙ্গে কোন ভাবেই বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত নয় তা সন্ধি যতই গভীর হোক না কেন।

" ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
ব্যবহারেণ মিত্রাণি জায়ন্তে রিপবস্তথা।।" [১০]

অর্থাৎ কেউ কারো বন্ধু বা শত্রু নয়। ব্যবহারই ঠিক করে দেয় কে শত্রু হবে বা কে বন্ধু হবে।

" স বন্ধুর্যো বিপন্নানামাপদুদ্ধরণক্ষমঃ।
ন তু দুর্বিহিতাতীতবস্তূপালম্ভপণ্ডিতঃ।।" [১১]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্তকে বিপদের সময় রক্ষা করে, সেই প্রকৃত বন্ধু। আর যে ব্যক্তি এই কাজ ভালোভাবে করা হয়নি বা ঠিক সময়ে করা হয়নি এসব বলে নিন্দা করে, সে কখনই প্রকৃত বন্ধু হতে পারে না।

" স্বাভাবিকং তু যন্মিএং ভাগ্যেনৈবাভিজায়তে।
তদকৃত্রিমসৌহার্দমাপৎস্বপি ন মুঞ্চতি।।
ন মাতরি ন দারেষু ন সোদর্যে ন চাত্মজে।
বিশ্বাসস্তাদৃশঃ পুংসাং যাদৃঙ্ মিত্রে স্বভাবজে।।" [১১]

অর্থাৎ ভাগ্যের ফলে যে স্বাভাবিক বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয় সেই বন্ধুত্ব বিপদের দিনেও আমাদের ছেড়ে চলে যায় না। মানুষ এরকম বন্ধুত্বে বিশ্বাস করে। আর এরকম বিশ্বাস মা, স্ত্রী বা সহোদর ভাইয়ের উপরেও করা যায় না।

'উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।।' [১৩]

অর্থাৎ উৎসবে, আনন্দে, বিপদে, দুর্ভিক্ষে, দেশের বিপ্লবে, বিচারসভায় এবং শ্মশানে যিনি সর্বদাই সঙ্গে থাকে, সেই হল প্রকৃত বন্ধু।

হিতোপদেশে বন্ধুর বিভিন্ন প্রকারের উল্লেখ আছে। সেখানে বলা আছে -

"ঔরসং কৃতসম্বন্ধং তথা বংশক্রমাগতং।
রক্ষিতং ব্যসনেভ্যশ্চ মিত্রং জ্ঞেয়ংচতুর্বিধম।।" [১৪]

অর্থাৎ বন্ধু চার প্রকারে সৃষ্টি হয়। রক্তের সম্পর্কের ফলে, পারিবারিক সম্পর্ক থেকে, বংশানুক্রমে পাওয়া, এবং বিপদ থেকে রক্ষা করার ফলে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে। দেখা যাচ্ছে

হিতোপদেশে বন্ধু সম্পর্কিত কোনো বিষয়কেই বাদ দেওয়া হয়নি। আবার পরবর্তীকালে পন্ডিত বিষ্ণুশর্মা রাজকুমারদের শিক্ষাদানের জন্য যে পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়, তার পাঁচটি ভাগ। যথা ১) মিত্রভেদ ২) মিত্রপ্রাপ্তি ৩) কাকোলুকীয় ৪) লব্ধপ্রণাশ এবং ৫) অপরীক্ষিতকারক। পঞ্চতন্ত্রের প্রথম দুটি যে খন্ড অর্থাৎ মিত্রভেদ এবং মিত্রপ্রাপ্তি, এই দুটি খন্ডের নাম শুনলেই বোঝা যায় মিত্র অর্থাৎ বন্ধু নামের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক আছে তাদের। মিত্রভেদ অর্থাৎ বন্ধু বন্ধুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা আর তার পরের খন্ড মিত্রপ্রাপ্তি অর্থাৎ বন্ধুলাভ। দুটি খন্ডের সাধারণ অর্থ থেকে এটা স্পষ্ট যে মানবজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রূপে বন্ধুত্বের উত্থান-পতনের দিকটিকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সমাজে একজন প্রকৃত বন্ধুর লক্ষণ কী, কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত, বন্ধুর কর্তব্য বা দায়িত্ব কী হওয়া উচিত, ব্যক্তির জীবনে সুহৃদ বন্ধু থাকার ফল কী, একজন স্বার্থপর বন্ধুকে সর্বদাই বর্জন করা উচিত কেন, প্রভৃতি বন্ধুত্বের অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের নীতিমূলক জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে পঞ্চতন্ত্রে, অনেকটা হিতোপদেশের মতোই। মিত্রভেদে পন্ডিত বিষ্ণুশর্মা বলতে চেয়েছিলেন সমাজে স্বার্থপর বন্ধুর সংখ্যা মোটেও কম নয়, যারা স্বার্থকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে, বন্ধুত্বকে নয়। যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আমাদের জীবনে কোনভাবেই কাম্য নয়। আবার মিত্রপ্রাপ্তি খন্ডে তিনি দেখিয়েছেন বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালবাসা, বিশ্বাস, দায়িত্ব, কর্তব্যবোধের স্ফুরণের বিষয়টি। সমাজ জীবনে এমন বন্ধুত্বকেই তিনি প্রকৃতপক্ষে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন। পঞ্চতন্ত্রের প্রথম তিনটি খন্ডে এই সম্পর্কটিকে পন্ডিত বিষ্ণুশর্মা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছিলেন। উপকার পেলে মানুষ মানুষের বন্ধু হয়, স্বার্থের কারণেও বন্ধুত্ব হয়। মূর্খদের বন্ধুত্ব হয় ভয়ে বা লোভে, সজ্জন সজ্জনের বন্ধুত্ব হয় মত বা নীতির মিল হলে। এই রকম নানা বাস্তব প্রত্যক্ষগোচর অনুভূতির আলোকে পঞ্চতন্ত্র আজও সমাদৃত। জনপ্রিয়তায় এর স্থান বাইবেলের পরেই। মানবচরিত্র বা মানবিক সম্পর্কের বিভিন্ন রূপকে পন্ডিত বিষ্ণুশর্মা গল্পে কখনও বনের পশু-পাখি, আবার কখনও মানবের মধ্য দিয়ে তুলে ধরে, মানবজীবনের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নীতি বা উপদেশ প্রদান করেছেন।

বিশ্বাস, হৃদ্যতা, ব্যবহার প্রভৃতি বন্ধুত্বের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে যে বড় অবলম্বন. হিতোপদেশ বা পঞ্চতন্ত্রে তা পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের রচয়িতারা বন্ধুত্বের স্বরূপ বা ধর্ম সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেছেন, তা যে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা পুষ্ট তা বোঝা যায়। বাস্তব জগৎ বা সমাজ বা মানবিক সম্পর্কের গতিপ্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম প্রকাশ পেয়েছে তাদের ধারণায়। হিতোপদেশে বিভিন্ন শ্লোকের মধ্য দিয়ে লেখক বন্ধুত্বের ভালো-মন্দ নানা দিকের সন্ধান দিয়েছেন। বন্ধুত্ব একটা সম্পর্ক আর এ সম্পর্ক সৃষ্টি বা রক্ষা করার অনেক নিয়ম-কানুন আছে। বাস্তবজীবনে সকলের সঙ্গে সকলের বন্ধুত্ব হয় না, আবার বন্ধুত্ব হলেও রক্ষা করার শর্ত আছে। সমাজজীবনে কার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব করা উচিত কার সঙ্গে নয়, এই সবের নীতি বা উপদেশমূলক গল্প হল এই পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশ। এই দুটি গল্পগ্রন্থে সামাজিক জীবনের অন্যান্য সম্পর্কের চেয়ে বন্ধুত্ব বিষয়েই আলোকপাত করা হয়েছে বেশি। এমনিতেই এই গ্রন্থদুটি বিচিত্র উপদেশের ভাণ্ডার। সমাজজীবনের অনেক কিছুর আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। বন্ধুত্ব নিয়েও এখানে আছে বিস্তারিত আলোচনা। গল্পের ছলে বনের পশু-পাখি যেমন সিংহ, কাক, ইঁদুর, কচ্ছপ, হরিণ প্রভৃতিকে পাত্র-পাত্রী হিসেবে তুলে ধরে এখানে তাদের নানা কার্যধারার মধ্য দিয়ে মানব জীবনের উদ্দেশ্যে উপদেশ বা জ্ঞান প্রদান করছেন রচয়িতারা। তবে পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের কাহিনি আকর্ষণীয় হলেও যেহেতু তা ছিল উপদেশমূলক, তাই বন্ধুত্ব সম্পর্কে এখানে যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে রচয়িতাদের উপদেশের ভাবটিই বেশি বর্তমান।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী এক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যশাখা হিসেবে স্বীকৃত। মূলত রাধা এবং কৃষ্ণের প্রেমলীলা এর মুখ্য বিষয়। কিন্তু এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে বন্ধুত্ব সম্পর্কের উপস্থিতি যার আধার হল 'সখ্যরস'। 'সখ্যরস' বৈষ্ণবীয় পঞ্চরসের অন্যতম একটি রস। এই রসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কিছু বৃন্দাবন বালকের সখ্যতার অর্থাৎ বন্ধুত্বের

সম্পর্কের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তবে সেগুলো পঞ্চতন্ত্রের বা হিতোপদেশের মতো উপদেশমূলক নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে সাধারণ বালকের পর্যায়ে নেমে এসে, শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি বালকের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে লীলা করে চলেছে। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে তাই সখ্য বা মৈত্রীরস। এইরকম রসের মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুত্বের স্বাদকে আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন। বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এক অকৃত্রিম আনন্দ লাভ করতে চেয়েছিলেন। সখ্যরসে শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি বালক শ্রীকৃষ্ণের শক্তিময় রূপের কথা জেনেও তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে তার সঙ্গে এক সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। এই সখ্যরসে কৃষ্ণের সঙ্গে তাদের প্রভু, দাস বা অন্য কিছুর সম্পর্ক নেই, কেবল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। আর এই বন্ধুত্ব কৈশোরকালীন। তাই কিশোর জীবনের সহজ, স্বাভাবিক বন্ধুত্ব তাদের সম্পর্কে স্থান পেয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাবে উপন্যাস সৃষ্টির আগে সাহিত্যে বন্ধুত্বের উপস্থিতি কিছু কাব্য, গল্প প্রভৃতিতে দেখা গিয়েছিল। রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশ, বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতি সাহিত্যে এই সম্পর্কের মধুর বা কুৎসিত চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছিল। এর পরে বর্তমান যুগে উপন্যাস নামে যে এক বৃহত্তর মানব বা সমাজপট সৃষ্টি হয়েছে, তখন সেখানে এই সম্পর্কটির বেশি করে আত্মপ্রকাশ ঘটে, বৈচিত্র্যময় ভাবনার দ্বারা সিক্ত হয়ে। আমরা জানি উপন্যাস হল সমাজ জীবনের দর্পণ। উপন্যাস এমন একটা পট যেখানে মানবজীবন বা সমাজের সমস্ত ছবি প্রতিফলিত হয়ে থাকে। মানুষকে সাহিত্যে দেখার বাসনা আগেও ছিল, কিন্তু উপন্যাসে এসে তা আরো বিস্তৃতি এবং পরিপূর্ণতা লাভ করে। উপন্যাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাস্তবতা। কল্পিত কাহিনি, রূপকথা বা আরব্যরজনীর গল্পের মতো অবাস্তব বিষয়ের উপর এর ভিত গঠিত নয়। সম্পূর্ণ বাস্তব জীবন বা সমাজকে নিয়েই এর কারবার। তাই দেখা যায় মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার সকল ছবি, সামাজিক বিভিন্ন ঘটনা, সমস্যা, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, অর্থাৎ বৃহত্তর সামাজিক জীবন বলতে যা বোঝায়; এইরকম বিষয়ই হল উপন্যাসের মূল

অবলম্বন। উনিশ শতকে উপন্যাস সৃষ্টি হলে সামাজিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বিভিন্ন সম্পর্কের বৈচিত্র্যময় দিকগুলো সেখানে উদভাসিত হতে আরম্ভ করে। সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে আমরা কারো না কারো সঙ্গে সম্পর্কের বাঁধনে জড়িত। বাস্তব জীবনে আমাদের পরিচয় পিতা, সন্তান, ভাই, দাদা, বন্ধু প্রভৃতি রূপে। উপন্যাস বাস্তব জীবনে এই সব সম্পর্কের বিচিত্র রূপ নিয়ে আলোচনা করে। আমাদের বাঙালি সমাজ চিরকালই পরিবারকেন্দ্রিক, যে পরিবারে আছে বিভিন্ন সম্পর্কের বন্ধন। বাংলা উপন্যাসে বাঙালি পারিবারিক জীবনের ছবি বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের স্রোতপ্রবাহ আছে। তার ভালো-মন্দ, আলো-আঁধারি রূপচিত্র আছে। বন্ধুত্ব বিভিন্ন রূপ নিয়ে বাংলা উপন্যাসে বারবার আবির্ভূত হয়েছে। উনিশ শতক বা বিশ শতকের বিভিন্ন উপন্যাসে লেখকরা সামাজিক সম্পর্কের একটি অঙ্গ হিসেবে বন্ধুত্বের বৈচিত্র্যময় স্ফুরণ ঘটিয়েছিলেন।

বাংলা উপন্যাসে বন্ধুত্ব হিতোপদেশ বা পঞ্চতন্ত্রের গল্পের মতো উপদেশমূলক রসে সিক্ত নয়। মানবজীবনে এই সম্পর্কটির যে রকম সচল প্রবাহ আমরা দেখি, তারই বাস্তবসম্মত চিত্র দেখা যায় উপন্যাসে। বাংলা উপন্যাসে বন্ধুত্ব এসেছে অন্যান্য সম্পর্কের মতো বিচিত্রভাবে সজ্জিত হয়ে। কখনও সেখানে ফুটে উঠেছে বন্ধুর মহিমান্বিত রূপ। পরোপকার, হৃদ্যতা, ভালোবাসা প্রভৃতি দিয়ে সেখানে সম্পর্কের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত। আবার কখনও সেখানে দেখা গেছে কুৎসিত ভাবের প্রবাহ। স্বার্থপরতা, হিংসা, ঈর্ষা, ক্ষতিসাধন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সম্পর্কের এক অন্ধকার রূপ সেখানে চিত্রিত। লেখকরা কখনও গুরুত্ব দিয়ে কাহিনিতে সম্পর্কটির এক বিশাল রূপরেখা টেনেছেন। আবার কখনও কাহিনিতে তাকে সামান্য জায়গায় দাঁড় করিয়ে বিশেষ গুরুত্ব ছাড়াই তার স্বল্প রূপরেখা টেনেছেন। সম্পর্কের চিরাচরিত মূল্যবোধ বা মূল্যহীনতার প্রশ্নেও উপন্যাসে দেখা গেছে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির বৈপরীত্য। বাংলা উপন্যাসের আবির্ভাব থেকে আজ পর্যন্ত দেড়শত বছরের উপন্যাস ইতিহাসে এ সম্পর্কটির বৈচিত্র্য অবশ্যই লক্ষ্য করার মতো। কারো বাস্তব ভাবনা, কারো বা দৃশ্যমান

জগতে সম্পর্কটির গতিপ্রবাহ, কারো আবার নিজস্ব বন্ধুর প্রতিরূপ দেখা গেছে উপন্যাসের পটরেখায়। আবার কাকতালীয়ভাবে হলেও দেখা গেছে যে সব ঔপন্যাসিকের জীবনে প্রচুর সংখ্যক বন্ধুর আবির্ভাব ঘটেছে, সেই সকল ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে এ সম্পর্কটির প্রাদুর্ভাব ঘটেছে বেশি। হয়ত বাস্তব বন্ধুত্বের পরশই উপন্যাসে এ সম্পর্কটির উপস্থিতি ঘটাতে তাঁদের উৎসাহিত করেছে। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাবকাল থেকে আমাদের আলোচ্য কালসীমার (১৯৫৭ খ্রিঃ পর্যন্ত) মধ্যে প্রচুর লেখকের উপন্যাসে ঘটেছে বন্ধুত্বের উপস্থিতি, আর সেইক্ষেত্রে বেশি দেখা গেছে পুরুষ বন্ধুত্ব। অর্থাৎ একজন পুরুষের সঙ্গে অপর একজন পুরুষের বন্ধুত্ব। দুই নারীর পরস্পর বন্ধুত্বের চিত্র বাংলা উপন্যাসে খুব বেশি নেই। আবার একজন পুরুষ বা একজন নারীর বন্ধুত্বও খুব বেশি প্রত্যক্ষ করা যায়নি। সমলিঙ্গের বন্ধুত্বই বাংলা উপন্যাসে বহুল দেখতে পাওয়া যায়। আর তা মূলত পুরুষের সঙ্গে পুরুষের। উনিশ শতকের স্বর্ণকুমারী দেবী, রাজকৃষ্ণ রায়, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাধানাথ মিত্র, চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখক থেকে আরম্ভ করে বিশ শতকের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকের উপন্যাসে ঘটেছে এ সম্পর্কটির আবির্ভাব। কখনও কাহিনিতে তারা বন্ধুত্বকে একটি মুখ্য সম্পর্ক রূপে স্থান দিয়ে, তার একটি পরিপূর্ণ রূপ অঙ্কন করতে চেয়েছিলেন। আবার কখনও তাঁরা কাহিনিতে এ সম্পর্কের স্বল্প উপস্থিতি ঘটিয়ে তাকে গুরুত্বহীন করে রেখেছিলেন। অনেক লেখকের মধ্যে আবার বন্ধু সম্পর্কে নিজস্ব চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে তার রূপ নির্মাণে, যেমন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে। বাংলা উপন্যাসে বন্ধুত্ব বাংলার সামাজিক জীবনের বন্ধুত্বেরই প্রতিচ্ছবি। বাংলার সামাজিক জীবনে পরিবারের চিরকালই একটি বড় ভূমিকা আছে। বন্ধুত্ব যদিও কোনো পারিবারিক সম্পর্কভুক্ত নয় বাহ্যিক সম্পর্ক, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এই সম্পর্কটি যেন পারিবারিক সম্পর্কেরই পর্যায়ভুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে তার পারস্পরিক আন্তরিকতা বা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে। বাংলা উপন্যাসে আজ পর্যন্ত সময়ে যে সম্পর্কটির প্রাধান্য, তা হল প্রেম। উনিশ বা বিশ শতকের উপন্যাস, সর্বত্রই প্রেম সম্পর্কের প্রাধান্য। কী সামাজিক জীবন,

কী সাহিত্য-সর্বত্রই নর-নারীর আকর্ষণজনিত প্রেম সম্পর্কের এক বিশাল প্রসার দেখা যায়। তার পাশে বন্ধুত্বের অবস্থান সমগোত্রের অবশ্যই নয়। কিন্তু সামাজিক জীবনে এই বন্ধুত্বেরও এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান আছে। পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে ব্যক্তি যার কাছে বেশি প্রশ্রয় লাভ করতে পারে, তা হল বন্ধু। অনেক-ক্ষেত্রে ব্যক্তির জীবনে বড় ভূমিকা বা প্রভাব ফেলে এ সম্পর্কটি। যেহেতু এই সম্পর্ক সৃষ্টির মূল আধার দুই ব্যক্তির হৃদয় নৈকট্য, সেক্ষেত্রে এই সূত্র ধরে ব্যক্তি ব্যক্তির জীবনে সাহায্য, সহানুভূতি, উপকার, সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদে সঙ্গদান প্রভৃতির মাধ্যমে এক স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে থাকে, যে ভাবে পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে থাকা কোনো রক্তের সম্পর্ক তার ক্রিয়াশীলতা দেখিয়ে থাকে। বাংলা উপন্যাসে সামাজিক সম্পর্করূপে বন্ধুত্ব স্বতন্ত্র জায়গায় স্থান পেয়েছে। যে সব উপন্যাসে পারিবারিক জীবনের ছবি আছে, সেখানে এই সম্পর্কটির সাবলীল বা ক্ষণস্থায়ী আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এমনকি শুধু পারিবারিক বা সামাজিক উপন্যাস বা কেন, অনেক ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি সমৃদ্ধ উপন্যাসের কাহিনিতেও বন্ধুত্বের প্রসার লক্ষ্য করা গিয়েছে। লেখকরা সেখানে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধুত্বের নানাবিধ রূপ অঙ্কন করতে চেয়েছিলেন। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা অপেক্ষা উপন্যাসই হয়ে উঠেছে এই সম্পর্কটির বৈচিত্র্যময় রূপপ্রকাশের প্রধান অবলম্বন।

সম্পর্কের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে তার পারস্পরিক যোগসূত্রতা একটি বড় অবলম্বন। সামাজিক ক্ষেত্রে কোনো সম্পর্কের মধ্যে যত বেশি যোগাযোগ, আদান-প্রদান ঘটবে, তত বেশি সে সম্পর্ক স্থায়ী হবে। যদি দেখা যায় তার যোগাযোগে ছেদ পড়েছে তবে রক্তের সম্পর্কেও দূরত্ব সৃষ্টি হয়। স্বভাবতই তা স্থায়িত্ব লাভ করে না। বন্ধুত্ব রক্তের বন্ধন নয় একটি গড়ে ওঠা সম্পর্ক, আর এই সম্পর্ক বাহ্যিক সম্পর্ক, অভ্যন্তরীণ নয়। বাস্তবে মা-বাবা-ভাই-বোন প্রভৃতি সম্পর্ক গৃহের অভ্যন্তরের সম্পর্ক যা জন্মের পর ঠিক হয়ে থাকে, কিন্তু বন্ধুত্ব বাইরের সম্পর্ক। কাজেই বাহ্যিক সম্পর্কের মতো কোনো সম্পর্কে যদি যোগাযোগের অভাব

LIBRARY
NBU, DARJEELING
271093

ঘটে, তবে স্বভাবতই তার স্থায়িত্ব নষ্ট হয়। বাংলা উপন্যাসে লেখকরা এই দিকটির কথা মনে রেখেছিলেন। তাঁদের রচনায় সম্পর্কের যোগসূত্রতা এবং যোগসূত্রছিন্নতা দুইই দেখা গেছে। আর যেখানে যোগসূত্র বেশি লক্ষ্য করা গেছে, সেখানে সম্পর্কের অস্তিত্ব দীর্ঘ হয়েছে, সহজে ভেঙে যায়নি। রবীন্দ্রনাথ বন্ধুত্বে এই যোগসূত্রের দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁর উপন্যাসে বন্ধুত্বের যোগসূত্রতা অত্যন্ত বেশি। শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর আবার দুটি দিকেই নজর দিয়েছিলেন। কল্লোল যুগের উপন্যাসে যোগসূত্রছিন্নের আভাসই বেশি। বাস্তবভাবের এই রকম পরশ লেখদের রচনার উপর যথেষ্ট পড়েছে। লেখকরা এই দুটি দিকে লক্ষ্য রেখে বন্ধুত্বের উজ্জ্বল অথবা অনুজ্জ্বল রূপায়ণ ঘটিয়েছেন।

আমাদের সামাজিক জীবনে চলার পথে বা প্রতিষ্ঠার পথে অনেকক্ষেত্রে কোনো নিকট সম্পর্কের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাস্তব সমাজে মানবের চরম লক্ষ্য হল কর্মপ্রতিষ্ঠা করা বা জীবনের রথকে একটি নির্দিষ্ট পথে সুষ্ঠুভাবে নিশ্চিত গতিতে টেনে নিয়ে যাওয়া। আর দেখা যায় সেইক্ষেত্রে মানব জীবনে কেউ না কেউ প্রভাব ফেলে। সে পিতা, মাতা বা ভাই, বোন, আত্মীয় প্রভৃতি যে কেউ হতে পারে। এরা মানবের জীবনে কখনও বড় ভূমিকা নিয়ে আবির্ভূত হয়। যার ফলে মানব স্রাষ্টশীলতা, কর্ম বা জীবনে প্রতিষ্ঠার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতার আশ্রয় পায়। অর্থাৎ সহজ কথায় বলতে গেলে অনুপ্রেরণা বা উৎসাহদান রূপে সমাজ জীবনে কারও না কারও বৃহৎ বা ক্ষুদ্র ভূমিকা অনেক সময় থাকে। আমাদের সমাজ জীবনে এই রকম চিত্র দেখতে পাই যেখানে বন্ধু, বন্ধুর জীবনে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে, তার কর্ম বা অন্যক্ষেত্রে এক বড় প্রভাব ফেলেছে। প্রাচীন রামায়ণ, মহাভারত বা পঞ্চতন্ত্রে এই বন্ধু প্রভাবের দিকটিকে আমরা যথেষ্ট দেখতে পেয়েছি। সামাজিক জীবনে একজন বন্ধুর ভূমিকার বিষয় সম্পর্কে ঔপন্যাসিকরা যথেষ্টই অবগত ছিলেন। বাংলা উপন্যাসে বন্ধু প্রভাব বা বন্ধু ভূমিকার বিষয়টি অনেক লক্ষ্য করা গেছে। যেখানে কাহিনিতে বন্ধুর জীবনে বৃহৎ কোনো কর্ম, চিন্তাধারা, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যসাধনে বন্ধু গভীর প্রভাব ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথ,

শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর প্রমুখ লেখকের উপন্যাসে এর দেখা মেলে। আর এর মধ্য দিয়ে সামাজিক জীবনে বন্ধুর কার্যকারিতার দিকটি বা উপযোগিতার বিষয়টিও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ফুটে ওঠে। মূল্যবোধের বিষয়টিও প্রসঙ্গক্রমে সেখানে এসে যায়। সামাজিক জীবনে বন্ধুত্বের যে ভূমিকা আছে, প্রবহমানতা আছে, গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নটি আছে, লেখকরা তা মেনে নিয়ে উপন্যাসে সম্পর্কটি সৃষ্টি করে তার একটা মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। লেখকরা যে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বা বাস্তব থেকে দূরে নয়, কাহিনিতে বন্ধুত্বের স্বাভাবিক চলমানতাই তার প্রমাণ দেয়।

বাংলা উপন্যাসে বন্ধুত্বের আবির্ভাব ঘটেছে প্রচুর, কিন্তু তার রূপায়ণগত দিকটি কেমন ছিল, এটি একটি বড় প্রশ্ন। দেখা গেছে রচনায় কোনো সম্পর্কের প্রবেশ ঘটলেও সম্পর্করূপে তার গুরুত্ব সর্বত্র সমান হয় না। সেটা অবশ্য স্বাভাবিক ঘটনা। কেননা উপন্যাসে বিভিন্ন সম্পর্কের প্রবেশ ঘটলেও সব সম্পর্ক তো প্রধান থাকে না। কিছু অপ্রধান বা গুরুত্বহীন সম্পর্কও থাকে। বাংলা উপন্যাসে বন্ধুত্বের রূপায়ণ বিভিন্নভাবে ঘটেছে। কখনও তাকে কাহিনির একটি প্রধান সম্পর্ক রূপে দেখা গেছে এবং কাহিনি, চরিত্রের ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন বা পরিণতি দানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আবার কখনও এই সম্পর্কটির রূপায়ণ হয়ে পড়েছে সীমিত। ফলে সেখানে সম্পর্কটি একটি গৌণ বা গুরুত্বহীন সম্পর্করূপে প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলা উপন্যাসে বন্ধুত্ব সম্পর্কের উপস্থাপক অনেক, কিন্তু সব লেখকের রচনায় প্রকাশ পায়নি তার দীর্ঘ রূপায়ণ। তবে দৃশ্যমান জগতে এই সম্পর্কটির বাস্তব গতিবিধি উপন্যাসে দেখা গেছে। লেখকরা তাঁদের উপন্যাসে বন্ধুত্বের বাস্তব চিত্র আঁকতে গিয়ে কখনও বন্ধুকে উদার, মহৎ করেছেন, আবার কখনও তাকে স্বার্থপর বা অসৎ রূপে গড়ে তুলেছেন। চরিত্রের এইরূপ বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের একটি স্পষ্ট রূপ কাহিনিতে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে। আবার বাংলা উপন্যাসে বন্ধুত্ব বিভিন্ন চরিত্রকেন্দ্রিক গড়ে উঠেছে। কখনও প্রধান চরিত্রের সঙ্গে প্রধান চরিত্রের বন্ধুত্ব, কখনও প্রধান চরিত্রের সঙ্গে গৌণ চরিত্রের বন্ধুত্ব, আবার

কখনও গৌণ চরিত্রের সঙ্গে গৌণ চরিত্রের বন্ধুত্ব লক্ষ্য করা গেছে। লেখকরা প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে বন্ধুত্বকে গড়ে তুলেছিলেন। তবে এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ একটু ভিন্নপথে হেঁটেছেন। তাঁর উপন্যাসে বন্ধুত্ব প্রধান চরিত্রের সঙ্গে প্রধান চরিত্রের। নায়ক এবং গৌণ চরিত্রের বন্ধুত্বকে তিনি বিশেষ নিয়ে আসেননি। এই কারণে তাঁর উপন্যাসে বন্ধুত্বের প্রসার বা জায়গা অত্যন্ত বেশি। গৌণ চরিত্রের কাহিনিতে যেহেতু বিশেষ গুরুত্ব থাকে না, তাই এই রকম চরিত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হলে কাহিনিতে তা বেশি প্রসার লাভ করে না বা গুরুত্ব পায় না। তবে বাংলা উপন্যাসে সব রকম চরিত্রের মধ্যে বন্ধুত্ব লক্ষ্য করা গেছে।

বাংলা উপন্যাসে পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বন্ধু বা মৈত্রী সম্পর্কের চিত্রই বেশি প্রতিফলিত। দু-একজন লেখক নারী এবং পুরুষের সম্পর্ককে পারস্পরিক আকর্ষণের বাইরে নিয়ে গিয়ে তার মধ্যে এক সুস্থ বন্ধুত্বের ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। নারী-পুরুষ বন্ধুত্ব নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন। যেমন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো দু-একজন লেখক উপন্যাসে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে এক সহজ স্বাভাবিক ভাব জাগাতে চেয়েছিলেন।অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'বিবাহের চেয়ে বড়' বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'দর্পণ', 'শহরবাসের ইতিকথা', 'চালচলন' প্রভৃতি উপন্যাসে নারী এবং পুরুষের সম্পর্ককে শুধু আকর্ষণের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হিসেবে না দেখে, উভয়ের সম্পর্ককে বন্ধুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে এনে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা সেক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে কামনা-বাসনার বাইরে নিয়ে গিয়ে এক সুস্থ বন্ধুত্বের গণ্ডীতে নিয়ে যেতে পারেননি। সেখানে কারো না কারো আকর্ষণ প্রকাশ পেয়ে গেছে। আবার উনিশ শতকের কিছু উপন্যাস বা বিশ শতকের দু-একটি উপন্যাসে নারীর সঙ্গে নারীর সখীত্বের চিত্র ধরা পড়েছে। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে সম্পর্কের ক্রিয়াশীলতা খুব বেশি মাত্রা পায়নি কাহিনিতে। বাংলা উপন্যাসে বন্ধুত্বের ভিতটি মূলত পুরুষের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বন্ধুত্ব বেশি চিত্রায়িত। আমাদের সামাজিক জীবনে নারীর সঙ্গে নারীর বন্ধুত্ব তৈরির অবকাশ

অনেক কম থাকে। কেননা সেক্ষেত্রে নারীর সামাজিক অবস্থান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য বর্তমান যুগে নারীর সঙ্গে নারীর মেলামেশার সুযোগ বেশি। নারীরা গৃহের বাইরের জগতে লেখাপড়া শেখা থেকে শুরু করে সবই করছে। পুরুষের সঙ্গে মিশছে, আবার নারীর সঙ্গেও মিশছে। সম্পর্ক গড়ছে, তবুও অবস্থানগত একটা বাধা বা অসুবিধা তো আছেই। নারী এবং পুরুষের বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও প্রায় একই কথা বলা চলে। কিন্তু পুরুষ-পুরুষের বন্ধুত্ব সৃষ্টিতে সেই বাধা নেই। তাই বাংলা উপন্যাসে এর প্রসার সর্বাধিক। কৈশোর, যৌবন বা প্রৌঢ়কালীন, সকল অবস্থার বন্ধুত্বের প্রবাহ বাংলা উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে বাংলা উপন্যাসে পুরুষ বন্ধুত্বের উপস্থিতি যেমন সর্বাধিক, তেমনি সমালিঙ্গের এ সম্পর্কের মধ্যে যৌবনপর্যায়ের বন্ধুত্বের প্রাদুর্ভাবই বেশি দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, মানিক, বনফুল, বুদ্ধদেব প্রমুখ ঔপন্যাসিক তাঁদের উপন্যাসে যৌবনকালের বন্ধুত্বকে তুলে ধরেছিলেন। আবার শরৎচন্দ্র, সতীনাথ, প্রেমেন্দ্রর মতে, কিছু ঔপন্যাসিক কৈশোরকালীন বন্ধুত্বের চিত্রকে দু-একটি উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' (১ম খণ্ড) প্রেমেন্দ্রর 'উপনয়ন' বা সতীনাথের 'অচিন রাগিনী'র মতো কিছু উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে কৈশোর বন্ধুত্বের ছবি। প্রৌঢ়কালীন বা বার্ধক্যকালীন বন্ধুত্ব বাংলা উপন্যাসে কম লক্ষ্য করা গেছে। বন্ধুত্ব মানব জীবনে সব পর্যায়ে গড়ে উঠতে পারে। বার্ধক্য, যৌবন বা কৈশোর-সব পর্যায়ে দেখা যায় বন্ধুত্ব সৃষ্টির দৃশ্য। দুইজন ব্যক্তির মধ্যে অকস্মাৎ এই সম্পর্কটির সৃষ্টি হতে পারে। এই সম্পর্ক সৃষ্টির মধ্যে যেমন সময়ের গণ্ডী নেই, তেমনি বিনাশেরও কোনো সময় সীমারেখা নেই। বাস্তব জগতের বন্ধুত্বের এই সমীকরণ লেখকদের রচনায় বাস্তবসম্মত ভাব নিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এমন কিছু উপন্যাস আছে যার মধ্যে এ সম্পর্কটির বৃহৎ ক্রিয়াশীলতা লক্ষ্য করা গেছে। গ্রহণযোগ্যতা বা মূল্যবোধের প্রশ্নেও সেখানে লেখকরা এক সুস্পষ্ট আভাস দিতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' বা তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসের বন্ধুত্বকে এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি। সেখানে লেখকরা সামাজিক বাস্তবতা দিয়ে বন্ধুত্বের এক মূল্যবোধকে বা গুরুত্বকে কাহিনিতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন।

উপন্যাস হল আধুনিককালের সৃষ্টি। এখানে বাস্তব সমাজের দৃশ্যমান ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকার প্রভৃতি চিত্র দেখা যায় হয়। বাংলা উপন্যাসে বন্ধুত্ব শুধু একটি সম্পর্ক রূপে আসেনি, বহুরূপে সে হয়েছে সজ্জিত। তবে সেখানে লেখকরা হিতোপদেশ বা পঞ্চতন্ত্রের মতো কোনো নীতি, আদর্শ বা উপদেশের পসার সাজিয়ে বসেননি। দৃশ্যমান জগত ও অভিজ্ঞতা দিয়ে এ সম্পর্কটির বিবিধ রূপ চিত্রণে তাঁরা হয়েছিলেন তৎপর। কেউ গুরুত্ব দিয়ে, আবার কেউ গুরুত্ব ছাড়া। আমাদের আলোচিত কালসীমার মধ্যে একশ বছরের বাংলা উপন্যাসে বন্ধুত্বের সরল-জটিল, ঘাত- প্রতিঘাত, ভালো-মন্দ প্রভৃতি যে রূপ দেখা গেছে, তাতে তার রহস্যময় দিকটি আমাদের সামনে স্পষ্টভাবেই উদভাসিত হয়।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সামাজিক মানুষ ধনী এবং গরীব, দুইই হতে পারে। আবার সম্পর্কের স্থায়িত্ব ও অস্থায়িত্বের ক্ষেত্রে অর্থ বা অর্থনৈতিক দিকটি এক বড় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। বাংলা উপন্যাসে ধনী এবং গরীব সব রকম বন্ধু লক্ষ্য করা গেছে। কিছু ক্ষেত্রে সম্পর্কের উপর অর্থনৈতিক দিকটি প্রভাব বিস্তার করেছে। উনিশ শতকের উপন্যাসের বন্ধুরা বেশিরভাগ অর্ধশিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির। রবীন্দ্র উপন্যাসের বন্ধুরা উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত। আবার শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের উপন্যাসে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত-এই দুই শ্রেণির বন্ধু লক্ষ্য করা গেছে। আর কল্লোলযুগের উপন্যাসে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির বন্ধু বেশি দেখা গেছে। একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করা গেছে যে লেখকরা নিজে যে অর্থনৈতিক শ্রেণি থেকে উঠে এসেছিলেন বন্ধুর চিত্র রূপায়ণে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই অবস্থাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন ধনী, শিক্ষিত পরিবারের লোক। তাঁর উপন্যাসে দেখা গেছে উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বন্ধুত্ব। শরৎচন্দ্র ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক। তাঁর উপন্যাসে বেশি বন্ধুত্ব মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে। আর কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের উপন্যাসের বন্ধুরা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত - এই দুই শ্রেণির। আবার মানিকের উপন্যাসে বন্ধুত্ব মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে। তারাশঙ্কর ছিলেন জমিদার বংশের লোক। তবে তাঁর উপন্যাসে

মধ্যবিত্ত এবং ধনী-উভয় শ্রেণির বন্ধুত্ব দেখা গেছে। আর একটা বিষয় উল্লেখ করার মতো যে বাংলা উপন্যাসে দুই বিপরীত অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব বিশেষ নেই। অর্থাৎ কেউ ধনী কেউ গরীব, আর তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব, এইরকম চিত্র খুব কম লক্ষ্য করা গেছে। আসলে দুই বিপরীত অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব যে বিশেষ গড়ে ওঠে না আর গড়ে উঠলেও তা যে স্থায়ী হয় না, এই চরম সত্যকে অধিকাংশ লেখকই হয়ত স্বীকার করতেন। তা না হলে বেশিরভাগ লেখক ধনী এবং গরীবের বন্ধুত্বকে দেখাননি কেন? স্বার্থের সঙ্গে অর্থনৈতিক দিকটি বিশেষভাবে জড়িয়ে থাকে। আর অনেকক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলে সম্পর্কের উপর। বাংলা উপন্যাসে বন্ধুত্বের রূপায়ণে অর্থনৈতিক বিষয়টিও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পড়েছে। বিপরীতধর্মী অর্থনৈতিক অবস্থাসম্পন্ন দুই ব্যক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব বিশেষ লক্ষিত হয়নি। প্রায় সবক্ষেত্রে সমশ্রেণির বন্ধুত্ব দেখা গেছে।

তথ্যসূত্র

১। বন্ধু (পথের সঞ্চয়) ,রবীন্দ্র রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রকাশক- বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৯৮, ১৯১৩ শক, পৃষ্ঠা- ৬৬৪

২। রাধামতি , শ্রী সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৩৮

৩। হিরণ্ময়ী, শ্রী রাজকৃষ্ণ রায়, প্রকাশক- আশুতোষ ঘোষ এবং কোম্পানি কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, প্রকাশকাল - কার্তিক ১২৮৬, পৃষ্ঠা- ৬৭

৪। স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা সংকলন, সংকলক - অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, প্রকাশক- দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০০/ আশ্বিন ১৪০৭, পৃষ্ঠা- ২৭৬

৫। পরিক্রমা , বুদ্ধদেব বসু, পৃষ্ঠা-৪২

৬। রামায়ণের চরিতাবলী , সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ, প্রকাশক - আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, প্রথম আনন্দ সংস্করণ - ১লা বৈশাখ ১৩৯৩, পৃষ্ঠা-১৪০

৭। মিত্রলাভ, (নারায়ণ প্রণীত হিতোপদেশ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড) সম্পাদক- সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, প্রকাশক- সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, তৃতীয় সংস্করণ ১৫ই আগষ্ট ২০০৪, পৃষ্ঠা- ৭৯

৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৬

৯। তদেব, পৃষ্ঠা-৮৪

১০। তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৩

১১। তদেব, পৃষ্ঠা-৪৪

১২। তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৯-১৬০

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা-৭৬

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪৩-১৪৪